BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph. D DEGREE

(2020)

TITLE

১৯৫০ - ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্বিন্যাস ও তার আলোচনা

(1950-2000 SAL PORJONTO BANGLA NATOKE MAHAVARATER KAHINIR PUNORBINYAS O TAR ALOCHANA)

RESEARCH SCHOLAR

RACHANA ROY

Assistant Professor, Department of Bengali
Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya
Sadhanpur-Uludanga, North 24 Parganas - 743221(W.B)

SUPERVISOR

Dr. SARMISTHA ACHARYYA

Assistant Professor & HOD
Department of Bengali
Sindri College, Sindri, Dhanbad, Jharkhand

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ধারণা (About Synopsis)

গবেষণার বিষয় (objective of Research):

১৯৫০ - ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্বিন্যাস ও তার আলোচনা

(1950-2000 SAL PORJONTO BANGLA NATOKE MAHAVARATER KAHINIR PUNORBINYAS O TAR ALOCHANA)

ভূমিকা (Introduction):

সাহিত্য রচনা আর গবেষণা করা এক বিষয় নয়। সাহিত্য রচনায় বাস্তব সত্যতার পাশাপাশি কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর গবেষণার মূল ভিত্তি হলো তথ্য ও সত্য। প্রমান, তত্ত্ব, উদাহরণ, তথ্য ও আলোচনার সাপেক্ষে একটি সার্থক গবেষণা সৃষ্টি হয়। তথ্য-প্রমানের পাশাপাশি যুক্তি-গ্রাহ্যতাও এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তির যথাযথ মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় গবেষণালব্ধ ফসল।

আমাদের বর্তমান গবেষণায় ১৯৫০-২০০০ সাল মধ্যবর্তী মহাভারত নির্ভর নাটকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মক। মূলত পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের এই গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার পরিধি সীমিত। ১৯৫০-২০০০ মধ্যবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় অনূদিত মহাভারতকে আশ্রয় করে যেসব নাটক রচিত হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করা গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

বলার ভঙ্গী (State-of-the-Art):

গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মক। নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পন্ন হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে নাট্যকারদের রচিত নাটক সংগ্রহ করে তার পাঠ ও বিশ্লেষণে রচিত হবে গবেষণার মূল বক্তব্য। সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী নাটকের সঙ্গে এজাতীয় নাটকের বড় কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাও বিচারমূলক পদ্ধতিতে আলোচিত হবে। গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও নাট্য সাহিত্য পত্রিকার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে একালের বিশিষ্ট নাট্যকারদের মতামতের ভিত্তিতে রচিত হতে পারে একালের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকের প্রয়োগের সার্থকতা।

গবেষণার সমস্যার বিবৃতি (Problem to be Investigated):

বাংলা ভাষায় অনূদিত মহাভারতকে আশ্রয় করে ১৯৫০ থেকে ২০০০ মধ্যবর্তী যেসব নাটক রচিত হয়েছে সেগুলির পাঠ ও বিশ্লেষণে গবেষণা কর্মটি সাধিত হবে। এই গবেষণায় উঠে আসবে একালের নাট্য সাহিত্যে মহাভারতীয় উপাখ্যানের বাস্তবানুগ প্রয়োগ।

- ১৯৫০-২০০০ সময়কালে রচিত মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলি কি কি?
- ১৯৫০-২০০০ মধ্যবর্তী নাটকে মহাভারতের অনুষঙ্গ বা কাহিনি কি ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে?
  চরিত্রে, সংলাপে, ব্যঞ্জনায়।
- কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে, কোন্ বিশেষ সমাজ ও মানব-জীবনের প্রেক্ষাপটে মহাভারতের কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে?
- নাটকটিকে একালের সামগ্রী করে তুলতে নাট্যকার কোথায় মূল মহাভারত থেকে সরে এসে নাটকটিকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন?
- মহাভারতের ছোঁয়ায় নাটকটি কি ভাবে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠেছে?

উদ্দেশ্য (Objects of the Research):

বাংলা নাটকের জয়যাত্রায় মহাভারতের আখ্যান উপাখ্যানের পুনর্ব্যবহার ও পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়, যার সার্বিক আলোচনা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তাই একালের নাট্যচর্চায় তিন হাজার বছরের পুরনো কাহিনিকে নাটকের মধ্যে কেমন ভাবে নাট্যকারেরা

উপস্থাপিত করে তার প্রাচীনত্ব ঘুচিয়ে তাকে নতুন করে, নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন তার আলোচনা বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। এই আলোচনায় মূলত দেখাতে চেষ্টা করব নাট্যকার কেন এবং কিভাবে মহাভারতের প্রয়োগ করেছেন।

<u>অনুমান (Hypothesis):</u>

তিন হাজার বছর পূর্বের কাহিনিতে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন এ কালের যাপিত জীবনের ইতিকথা। এই গবেষণার অনুমানগুলি হল —

- ১৯৫০-২০০০ মধ্যবর্তী নাটকে মহাভারতের কাহিনি প্রয়োগের অভিনবত্ব।
- বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ সমাজ ও মানব-জীবনের প্রেক্ষাপটে মহাভারতীয় কাহিনির অবতারণা।
- নাটককে একালের সামগ্রী করে তুলতে কখনো কখনো মূল মহাভারত থেকে সরে এসে নাটকটিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন।

<u>গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology):</u>

বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনাত্মক গবেষণা (Analytical and Descriptive Research)

<u>সরঞ্জামাদি (Tools) :</u>

- ১. তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)
- ২. তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis)
- ৩. গ্রন্থাগারের ব্যবহার (Library Work)
- ৪. ব্যক্তিগত গ্রন্থসম্ভার (Personal Books, Purchased Books)
- ৫. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত (Interview with Related Personalities)
- ৬. আন্তর্জালিকার ব্যবহার (Use of Internet)

তাৎপর্য (Significance of Proposed Work):

পৌরাণিক কাহিনির তকমা থাকলেও মহাভারতের কথা ও কাহিনিতে যে জীবন দর্শন ও মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে তা আজও একালের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ কালের নাট্যকারেরা তাকে রূপায়িত করেছেন শৈল্পিক ও নান্দনিকতায়। বর্তমান গবেষণায় সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

<u>গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যত (Research Limitation & Future Work):</u>

১৯৫০ থেকে ২০০০, এই সময়কালের নাট্য আলোচনায় সবচেয়ে বড় সমস্যা আকরগ্রন্থের অপ্রতুলতা। নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক নাটক অভিনীত হয়েছে বটে কিন্তু পরবর্তীতে গতানুগতিক ভাবে গ্রন্থাকারে অথবা পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়নি কিম্বা এও বলা চলে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রণ বা পুনঃমুদ্রণ হয়নি। তবে আশার কথা সহজলভ্য না হলেও দুর্লভ নয়। ছড়িয়ে ছিটেয়ে হলেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এ সময়ের সংশ্লিষ্ট বই ও পত্রিকার উপস্থিতি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক’ নামক গবেষণামূলক গ্রন্থ অতি যত্নে, পাণ্ডিত্যে, দক্ষতায় ও সাবলীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকের গতি প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, অবদান, গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। এই বিস্তৃত আলোচনায় অবশ্য আলাদা করে মহাভারত নির্ভর নাটক প্রাধান্য পায় নি; সামগ্রিক পৌরাণিক নাটকের আলোচনা করেছেন গবেষক। পরবর্তীতে তাঁরই তত্ত্বাবধানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে শর্মিলা দাশ "উনিশ শতকে মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটক" বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও সেখানে বিশ শতক বা ১৯৫০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত মহাভারত নির্ভর বাংলা নাটকের কোন উল্লেখ নেই। অন্যদিকে মহাভারত চর্চার ওপর একাধিক গবেষণা রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক সুজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী "মহাভারত চর্চা ও বাঙালি মনীষা" নামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে বাঙালির মহাভারত চর্চার বিস্তারিত ইতিকথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ২০০০ মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা

নাটকের নাট্যকারেরা মহাভারতকে নতুন ভাবে প্রয়োগ করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করেছেন, তার বিস্তারিত আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয়নি।

এই গবেষণাটি মূলত গ্রন্থ নির্ভর। গবেষণাপত্রে ১৯৫০ পরবর্তী মহাভারত নির্ভর নাটকগুলির বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, বক্তব্য বিষয় বিশ্লেষণ করে সুসংবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় এখানে মহাভারতীয় নাটকের আধুনিকীকরণ দেখানো হয়েছে। এই গবেষণা সমাপ্ত হলে ১৯৫০ পরবর্তী বাংলা পৌরাণিক নাটকের তালিকায় মহাভারত আশ্রয়ী নাটকের তালিকা সম্পূর্ণ হবে। হয়তো ভবিষ্যৎ গবেষকদের মনে নতুন কোনো প্রশ্নের উদ্রেক করে তাকে নতুন কোন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। তাতে বাংলা নাট্য সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের ধারা সম্পূর্ণতা পাবে।

সম্ভাব্য সূচিপত্র (Tentative Chapterization):

- ভুমিকা (Introduction)
- *প্রথম অধ্যায় (First Chapter):* মহাভারত ও বাংলা নাটক
- *দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter): নির্মাণ-বিনির্মাণের ধারণা ও পরিচয়*
- *তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter):* পাঁচের দশকের (১৯৫০-১৯৬০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুর্নবিন্যাস ও তার পর্যালোচনা
- *চতুর্থ অধ্যায় (Forth Chapter):* ছয়ের দশকে (১৯৬১-১৯৭০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের নবরূপায়ণ
- *পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter):* সাতের দশকে (১৯৭১-১৯৮০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতীয় ঘটনার পুর্নবিন্যাস
- *ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter):* আটের দশকে (১৯৮১-১৯৯০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির প্রয়োগ ও পর্যালোচনা
- *সপ্তম অধ্যায় (Seventh Chapter):* নয়ের দশকে (১৯৯১-২০০০ সাল) নতুন রূপে বাংলা নাটকে মহাভারতীয় বিন্যাস
- *উপসংহার (Conclusion)*

তথ্যসূত্র (Reference) :
নির্ধারিত APA ধারা অনুসরণ করে তথ্যসূত্রের উল্লেখ।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):

I. আকর গ্রন্থ (Primary Source)
II. সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source)
III. পত্রপত্রিকা (Journals)

শিরোনাম:

১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্বিন্যাস ও তার আলোচনা

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য বারে বারে পুরাণকে নিজের কালের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছে। চতুর্দশ শতকে বড়ুচণ্ডীদাস যেমন কৃষ্ণ কথার মূল কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে কৃষ্ণ চরিত্রে প্রকাশ করেছিলেন তুর্কি আক্রমণোত্তর যুগসমাজের স্খলিত লাম্পট্য। তেমন করে যুগ যুগ ধরে পুরাণ নবনির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী হয়ে পাঠকের সামনে ধরা দিয়েছে। আসলে মহাকবির কলমে এমনই যাদু ছিল যে, তা যে কোনো কালের, যে কোন সমাজের, যে কোন পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত।

এই কারণেই বাংলা সাহিত্যিকগণ বারেবারে মেদ-মাংস ঝরিয়ে কেবল কঙ্কালকে নিয়ে মহাভারতের নানা কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনার বিনির্মাণ করে সমকালীন দৃষ্টিতে তাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বা প্রতিভা বসু মহাভারতের নানা চরিত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা করে পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে দোলায়িত করেছেন। নব আলোকে, নতুন ভাবনায় পাঠক চরিত্রগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পুরাণ কাহিনির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চিত ও বিনির্মিত হয়েছে মহাভারত। কারণ মহাকবি শত সহস্র শ্লোকে, কয়েকশো প্রধান-অপ্রধান চরিত্রে যে বিপুল ঘটনা সমূহের বিবরণ দিয়েছেন, তার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। মহাকবি ভাবীকালের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমৃত ভান্ডার। সেই ভান্ডার থেকে মণিমুক্তো সংগ্রহ করে শিল্পীরা সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন সাহিত্য। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে তার বাস্তবায়ন ঘটেছে নতুনত্বে ও নান্দনিকতায়। বর্তমানকালের কাছে সে কাহিনি হয়েছে প্রাসঙ্গিক এবং প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণীয় আর কাহিনি, চরিত্র, ঘটনাগুলি হয়ে গেছে আধুনিককালের সামগ্রী।

বহু সমালোচক মনে করেন, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা মৌলিক নাটকের জন্মলগ্ন থেকে পৌরাণিক নাটকের প্রতি বাঙালির দুর্বলতা থাকলেও কালের গতিতে, সময়ের স্রোতে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে ১৯৪০-এর দশকের পর থেকে পৌরাণিক নাটক রচনায় ভাঁটা পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বক্তব্যটিতে যুক্তি আছে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সমগ্র বিশ্বে যে অস্থিরতা, নৈরাশ্যবাদ, অর্থনৈতিক সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছিল রূপক সাংকেতিক, অ্যাবসার্ড বা থার্ড থিয়েটারের মত নাটক। এখানে মানুষের বাস্তব জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। 'পূর্ণিমার চাঁদ' কে আর রোমান্টিকতায় নয় বরং 'ঝলসানো রুটি'র মত বাস্তবিক বলে মনে হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে পৌরাণিক পটভূমিতে দেব-দেবতা বা রাজা-মহারাজাদের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনির কোন স্থান ছিল না পাঠক সমাজে। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে বোঝা যাবে পুরাণ বা মহাভারতের কাহিনির স্রোতে মিশে আছে আধুনিক জীবনের যাবতীয় উপাদান। তাই সহজেই সাহিত্যিকেরা মহাভারতের বিরাট কলেবরে নিজস্ব ভাবনা ও আদর্শকে মিশিয়ে তাকে একালের বস্তু করে তুলেছেন। উপন্যাস-কবিতাতে তো বটেই, নাটকেও বারেবারে আধুনিক জীবন পটভূমিকায় স্থান নিয়েছে মহাভারত নির্ভর কাহিনি। অতএব বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগে মহাভারতের কাহিনি কখনই অপ্রাসঙ্গিক নয় বরং তা আরো অনেক বেশি গ্রহণীয়। এখানেই মহাকবির সার্থকতা আর আধুনিক লেখকদের সিদ্ধি।

‘যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে’ – প্রবাদটি বাংলাদেশে সুপরিচিত। কোন সেই সুদূর কালে রচিত মহাভারতের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মানব-সভ্যতা, মানব-সমাজ ও মানব-মনস্তত্ত্বের গভীর-জটিল, বহু গ্রন্থিক জীবন ইতিহাস। আধুনিক কম্পিউটার যুগে এসেও বিস্মিত হতে হয় মহাভারতের কবির আশ্চর্য জীবন ও মানব মনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতায়। একেই হয়তো বলে মহাকাব্যিক চেতনা। বর্তমান অনুসন্ধানে দেখাতে চেষ্টা করা হবে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৫০-২০০০ সালের মধ্যে) যে সমস্ত বাংলা নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে –

- মহাভারতের অনুসঙ্গ ও কাহিনি কি ভাবে এসেছে।
- কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে, কোন্ বিশেষ সমাজ ও মানব-জীবনের প্রেক্ষাপটে মহাভারতের কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে।
- কোন বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করতে গিয়ে মহাভারতের কাহিনির কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে কিনা।
- যদি তা হয়ে থাকে, তা হলে, তা কতখানি প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ হয়েছে।

– এক কথায় বর্তমান পর্যালোচনার বিষয় আধুনিক নাট্যকারদের কলমে সেই হাজার হাজার বছর আগের মহাভারতের কাহিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তারই গভীর পাঠ ও বিশ্লেষণ। সামগ্রিক পৌরাণিক নাটক নিয়ে বাংলা ভাষায় একাধিক যুক্তিপূর্ণ, উচ্চমানের আলোচনা হলেও কেবলমাত্র আধুনিক নাট্যকারদের (১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল) কলমে কেন বারবার মহাভারতের প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ কাহিনি ব্যবহৃত হয়েছে তার সুচিন্তিত আলোচনা হয়নি। আমাদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অনেকাংশে এটাই যে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক নাটকে মহাভারতের কাহিনিকে দেখা ও তার বিচার বিশ্লেষণ করা যাতে বাঙালি পাঠক সমাজ পৌরাণিক নাটকের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আরো একটু বেশী সম্বৃদ্ধ হতে পারেন।

বর্তমান গবেষণায় আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা ভাষায় রচিত দুটি মহাভারতকে:

১. কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত

ক) কাশীরাম দাস, কবি ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, মহাভারত (প্রথম খণ্ড), বসুমতি সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ৩৩তমসংস্করণ, ১৩৯৫

খ) কাশীরাম দাস, কবি ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), বসুমতি সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০১৫

২. রাজশেখর বসু রচিত মহাভারতের সারানুবাদ

রাজশেখ বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি:, চতুর্দশ মুদ্রণ, ১৪২০

প্রথম অধ্যায় : মহাভারত ও বাংলা নাটক

মহাকবি তাঁর কাব্য বর্ণনার যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেই আনন্দে পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ সৃষ্টি করেছেন একের পর এক গল্প-গাথা-কাহিনি। আনুমানিক তিন হাজার বছর ধরে এই ধারা বহমান। এই সূত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম পর্বের প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসের কথা।বস্তুত সংস্কৃত কবিদের কবিপ্রতিভা অনেক ক্ষেত্রে মহাভারতের বিষয় নিয়ে কাব্য ও নাটক রচনায় সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত দুটি মহাকাব্যই ছিল নাট্যকারদের পছন্দের বিষয়। সংস্কৃত নাটকে ভাসের পরেই স্মরণীয় মহাকবি কালিদাস।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ধারা উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের নাট্য ধারায় খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে আমাদের ধারণা। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ক্ষীণধারা বাংলার সমাজে প্রবাহিত ছিল বটে কিন্তু বাঙালি নিজের মতো করে তাকে গড়ে নিয়েছিল। কৃষ্ণকথার সূত্র ধরে নাচ-গান সমন্বিত 'নাটগীতি' মধ্যযুগে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের উৎপত্তিতে সংস্কৃত নাটকের তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশীয় লেবেডেফ বাংলা নাটক প্রচলনের যে চেষ্টা করেছিলেন তা একান্তই বিদেশি রঙ্গালয়ের অনুকরণে। পরবর্তীতে বাঙালিও যে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তাতে ব্রিটিশদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। বিশেষত শেক্সপীয়ারের নাটক সমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল বলে গবেষকগণ মনে করেন।

উনবিংশ শতকে ইংরাজি নাটকের ভাবাদর্শে তারাচরণ শিকদারের লেখা প্রথম নাটক ‘ভদ্রার্জুন’, যার অবলম্বন মহাভারত। বাংলা নাটকের ইতিহাসে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে মহাভারত নির্ভর নাটকের সূচনা নাট্যসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই। মধুসূদন দত্ত, মনমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমূখ প্রতিভাবান নাট্যকারদের হাতে বাংলা মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর নাটকে ভক্তি রসের আমদানি করে বাংলা পৌরাণিক নাটককে তিনিই বাঙালীর হৃদযের সামগ্রী করে তুলেছেন। এরপর মন্মথ রায় মহাভারতকে নাটককে ব্যবহার করলেন রাজনৈতিক অনুসঙ্গে। ব্রিটিশ ভারতে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও পরে পৌরাণিক তক্মাতেই মঞ্চস্থ হওয়ার ছাড়পত্র পায়। আসলে মহাভারতের কাহিনির প্রতি মানুষের একটি সবিশেষ টান আছে, সেই কারণেই শতাব্দীর

পর শতাব্দী পার হলেও মকাব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আজও অমলিন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসে এ মানবায়ন যে কতখানি সুদূর প্রসারী তা আমরা একবিংশ শতকে নাট্যকারদের রচনায় প্রমাণ পাই। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শিব মুখোপাধ্যায় বা ব্রাত্য বসু তাদের কলমে মহাভারতের যে কাহিনি রচনা করেন, তা একেবারেই হয়ে যায় এ যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্মাণ-বিনির্মাণের ধারণা ও পরিচয়

সাহিত্য এগিয়ে চলে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান নির্মাণ ও বিনির্মাণ। বস্তুত নির্মাণ-বিনির্মাণের নিরন্তর পথ চলায় সাহিত্য ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়। এই ধারা বহমান আদিকাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত। নতুন যুগের, নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বিনির্মাণের উপাদান। এই হিসেবে মহাকাব্য যুগে যুগে, কালে কালে সমকালীন ব্যাখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে। রাম, সীতা, রাবণ, মেঘনাদ, গান্ধারী, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, কুন্তী সাহিত্যিকদের কলমে নতুনভাবে বিনির্মিত হয়েছে বারবার। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে রামায়ণ মহাভারতের পাশাপাশি নানা লোককাহিনি ও পুরাণের গল্প-গাথা প্রচলিত। এই গল্পের আকর্ষণ মানুষের কাছে চিরকালীন। সাহিত্যিকেরা এইসব কাহিনিকে নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, পৌরাণিক কাহিনি গ্রহণ-বর্জন করে, নিজেদের সমকাল ও বোধের সঙ্গে মানানসই করে নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমগ্র কাহিনি নয়, সাহিত্যিক স্বাধীন কল্পনা শক্তিতে সমকালের প্রেক্ষিতে কখনো অংশবিশেষকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কখনো গুরুত্ব দিয়েছেন তার ইতিহাসকে, কেউবা চরিত্রের অন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংকুলতাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির হেরফেরের প্রভাবে একই কাহিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন দ্রৌপদী চরিত্রটি বিভিন্ন নাট্যকারের কলমে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। নাট্যকার শাঁওলি মিত্র 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটটিতে দ্রৌপদীকে দৃপ্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন, নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 'যাজ্ঞসেনী' নাটকে দ্রৌপদীর যন্ত্রণাকে সে ভাবে ব্যক্ত করেননি। 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকে দেখেছিলাম দ্রৌপদী অর্জুনকে একান্তে পাবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। বিপরীতে 'যাজ্ঞসেনী' নাটকে দেখা যায় দ্রৌপদী একই সঙ্গে তার সব পতিদের প্রতি সমদর্শী। সেখানে অর্জুনের প্রতি তার হৃদয়ে আলাদা কোনো স্থান নেই। আবার বুদ্ধদেব বসু 'সংক্রান্তি' নাটকে ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মনোজ মিত্র 'যা নেই ভারতে' নাটকে ধৃতরাষ্ট্রকে সেভাবে ধরেননি। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পীর চিন্তার বিভিন্নতায় একই ঘটনা বা চরিত্রের প্রকাশ বদলে গেছে। লক্ষণীয় মহাভারতের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে বাদল সরকার 'উদ্যোগ পর্ব', মনোজ মিত্র 'অশ্বত্থামা', ব্রাত্য বসু 'জতুগৃহ' নাটকে অস্থিরময় হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনীতিকে আভাসিত করেছেন। বিনির্মিত সেই কাহিনির অবয়ব থেকে খসে পড়েছে প্রাচীনত্ব, তা নতুন ভাষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই নতুন ভাষ্যকে সমালোচকগণ মিথের পুনর্জন্ম বা পুনর্নির্মাণ ভাবতে পছন্দ করেছেন। এইসব কাহিনির বাহ্যিক আবরণে নতুন ভাষ্য দৃশ্যমান হলেও অন্তরে রয়েছে প্রাচীন কাহিনির মূল সূত্র। সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "....... একই বীজ থেকে — শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে — বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।" এ গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ১৯৫০-২০০০ মধ্যবর্তী সময় মহাভারতের কাহিনি কিভাবে বাংলা নাটকে নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র:

১. বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, সিগনেট প্রেস, ২য় মুদ্রণ, জানু ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪

তৃতীয় অধ্যায় : পাঁচের দশকের (১৯৫০-১৯৬০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্বিন্যাস ও তার পর্যালোচনা

দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী পশিমবঙ্গ তখন নানা কারণে বিপর্যস্ত। এর মধ্যে মহাভারতের কাহিনি নিয়ে নাটক রচিত হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখ করা যায় মহেন্দ্র গুপ্তর 'সারথি শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৫৪), পূর্ণচন্দ্র দাশের 'উত্তরা' (১৯৫৪), ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত 'কুরুক্ষেত্রের আগে' (১৯৫৪), এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯৫৭)।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মন্মথ রায় কারাগার নাটকে পৌরাণিক পটভূমিতে সমকালীন রাজনীতিকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী সময় অন্যান্য নাটক রচনা করলেও পৌরাণিক নাটকে মহাভারতের কাহিনি প্রাধান্য পায়নি। ১৯৫৪ সালে একটি নাটকের নামকরণ করছেন 'মহাভারতী'।

নামকরণে মহাভারত ব্যবহার করলেও নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ মধ্যবর্তী বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ। কৃষক মহাভারতের পরিবারকে কেন্দ্র করে এ কাহিনিতে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন বাঙালি সংগ্রামী শহীদদের অকুতোভয় মানসিকতা। গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়েরা যেভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার অপূর্ব কথন রয়েছে এ নাটকে। এককথায় বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত তথ্যচিত্র এ নাটক।

ভারতীয় বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ পরমপূজনীয় দেবতা নারায়ণ। পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করার অভিপ্রায়ে নররূপ ধারণ করে মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তারই সুচতুর কৌশলে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল ‘ধর্মযুদ্ধ’। পৃথিবীর ‘তারণহার’ শ্রীকৃষ্ণ আপন জীবন দিয়ে সমগ্র ধরণীকে পাপমুক্ত করায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব' থেকে শুরু করে 'মৌষলপর্ব' পর্যন্ত কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে ‘সারথি শ্রীকৃষ্ণ’ নাটকটি; যার রচয়িতা মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-১৯৮৪)। মহেন্দ্র গুপ্ত বাংলা নাট্য সাহিত্য জগতে একজন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার হিসেবে সম্মানীয়। পুরাণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসায় তিনি পৌরাণিক নাটক সৃষ্টি করেছেন। আধুনিককালের সমস্যাদীর্ণ জীবনকে কিছুটা পাশে সরিয়ে রেখে পুরাণের প্রতি অনুগত থেকে পৌরাণিক আবহে রচনা করেছেন 'সারথি শ্রীকৃষ্ণ'। মহাভারতের চরিত্রগুলিকে তিনি মহাভারতীয় করেই উপস্থাপিত করেছেন। চরিত্রগুলির নবনির্মাণ বা বিনির্মাণে তিনি মনোযোগী হন নি; পক্ষান্তরে পৌরাণিক পরিমণ্ডলকে অক্ষুন্ন করে মহাভারতীয় চরিত্রগুলিকে মানবিক রূপ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও অলৌকিকতা থাকলেও, নাট্যকার তাকে খুব বেশি প্রশ্রয় দেননি। আসলে যে সময়ে এ নাটক রচিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সেই সময়ে নানা সমস্যায় (বিশেষত উদ্বাস্তু সমস্যায়) জর্জরিত। দেশবিভাগের বিষময় ফল ভোগ করেছেন লক্ষ্য লক্ষ্য অসহায় মানুষ। এই পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের প্রকাশ করে নাট্যকার বাঙ্গালিদের আত্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আসলে মহাভারত এমন এক কাহিনি যেখানে মহাকবি মহাকালের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় : ছয়ের দশকে (১৯৬১-১৯৭০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের নবরূপায়ণ

ষাটের দশকে একাধিক প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাট্যরচনায় বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শম্ভু মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেশের নানা সমস্যা-সংকট নিয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি মহাভারতের কাহিনি নির্ভর নাটক রচনা করে বুদ্ধদেব বসু খ্যাতি লাভ করলেন। অত্যন্ত দক্ষতায় পৌরাণিক চরিত্রের বিশ্লেষণে আধুনিক মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ করে তিনি পুরাণকে প্রতিষ্ঠা দিলেন আধুনিক মানসপটে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা পৌরাণিক তথা পুরাণ নির্ভর সাহিত্য রচনা সবচেয়ে বেশি হলেও আধুনিক মননসঞ্জাত করে তাকে প্রথম সাহিত্যে তুলে আনলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের আধারে পুরাণ রূপায়িত হল নব ভাষ্যে। সেই ধারাকে অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসুর পুরাণ নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রয়াস। অধ্যাপনা সূত্রে কেবল নয়, ছেলেবেলা থেকেই পুরাণ তথা রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই ইউরোপীয় সাহিত্যের একজন গভীর অনুসন্ধিত্সু পাঠক হয়েও তিনি ভারতীয় পুরাণকে বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লিখেছেন ‘মহাভারত কথা’। এখানে তিনি বিবিধ ঘটনা, চরিত্রকে নতুন নতুন ভাবনায় আলোকিত করেছেন। ১৯৩১এ লিখিত তাঁর প্রথম পুরাণ নির্ভর নাটক 'রাবণ'। যদিও কয়েক বার মহড়া দেওয়া সত্ত্বেও তা অভিনয় হয়নি আর প্রকাশিতও হয়নি। পরবর্তী সময়ে পুরাণ নির্ভর অজস্র কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের রূপকার বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করলেন কিছু কালজয়ী কাব্যনাট্য - ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ (১৯৬৬), ‘কালসন্ধ্যা’(১৯৬৯), ‘প্রথম পার্থ’ (১৯৬৯), ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ (১৯৭০), এবং ‘সংক্রান্তি’ (১৯৭০)। এগুলো মূলত কাব্যনাটক হিসেবেই পরিচিত। তবে আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় এগুলিকে নাটক হিসেবে ধার্য করে কাব্যগুণকে কিছুটা পাশে সরিয়ে রেখে এর নাট্যগুণ তথা নাটকীয়তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে লেখকের বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যনাট্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'(১৯৬৬)। নাটকের শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু জানাচ্ছেন —

> *“...এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত-অর্থাৎ, একটি পুরাণকাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; ......”*[১]

— এ স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, নাট্যকার ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকটিকে কোনো পৌরাণিক নাটক হিসাবে রচনা করতে চান নি, চেয়েছেন পুরাণের ছাঁচে আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বকে ধরতে। পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গ হয়েছেন উর্বরতার প্রতীক। কিন্তু পুরাণ বা রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনির উল্লেখ থাকলেও নেই তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা — যা আছে আধুনিক কবি নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু রচিত ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকে।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'কালসন্ধ্যা' নাটকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করলেন মহাভারতের মৌষল পর্বকে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়তি ও স্বাভাবিকতাকে প্রকাশের পাশাপাশি নাট্যকার প্রকাশ করেছেন জীবনের এক চরম নিয়তিবাদকে, যা আবর্তিত হয় মনুষ্য সমাজে। 'কালসন্ধ্যা' নামকরণেও আধুনিক জীবনের সমস্যাদীর্ণ সংকটের ইঙ্গিত স্পষ্ট। মিথ-পুরাণ সন্ধানী বুদ্ধদেব বসুর কলমে পৌরাণিক কাহিনি শিল্পীর আঁচড়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে জীবনের চির প্রবহমানতায়। মৌষল পর্ব আসলে মানব ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনি। ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গের অস্থিরতা পরিস্ফুট এ নাটকের সংলাপে। এক অনতিক্রম্যনীয়, অনাগত মহা ভবিষ্যতকে মেনে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকার। আসলে জীবন একটি বৃত্তের মতো। তা কেবল চক্রাকারে আবর্তনরত। তাই উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা চক্রাকারে চলতেই থাকে। ব্যাসদেবের কথা সূত্রে বলা যায় —

“কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।”[২]

বাদল সরকারও 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে এই ঘূর্ণায়মান চক্র পথের পরিক্রমণ এর মধ্য দিয়ে জীবনের বৃত্তাকার ঘূর্ণায়মান জীবনের ইঙ্গিত করেছেন। প্রায় সমকালে লেখা মহাভারতের মৌষল পর্বকে অবলম্বন করে বুদ্ধদেব বসু 'কালসন্ধ্যা' নাটক যা শোনালেন তা মহাভারতের প্রায় হুবহু অনুকরণ হয়েও আধুনিক সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত।

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করলেন 'প্রথম পার্থ'। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্যের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পূর্ণ অবগাহন করার পর বুদ্ধদেব বসু এ কাহিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে একটু ভিন্ন পথে চালনা করলেন। শুধু কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর আবেগপ্রবণ কথোপকথন নয়, নাট্যকার যুক্ত করলেন আরো দুটি চরিত্র — দ্রৌপদী এবং শ্রীকৃষ্ণকে। নাট্যকার কাহিনি থেকে কিছুটা সরে এসেছেন হয়তো। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে কুন্তী, দ্রৌপদী বা কৃষ্ণের কথোপকথনের উপস্থাপন দক্ষতায় তা একেবারে যেন মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্যে দেখিয়েছিলেন মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল স্নেহকাতরতা। পুত্রের মঙ্গলকামনায় কর্ণকে তার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে কর্ণকে পান্ডব পক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন কুন্তী। কর্ণ বীর, দাতা প্রতিশ্রুতি পরায়ন। বন্ধু দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, পরাজিত হবে জেনেও সে সানন্দে পরাজয়ের গ্লানিকেই বরণ করে গৌরাবান্বিত হতে চেয়েছে। আমরা জানি না, মহাকবি ব্যাসদেবের কলমে এমন কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কর্ণ চরিত্রে ছিল কিনা। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একেবারেই মানবিক দ্বান্দ্বিকতায়, কোমলে-কাঠোরে, বঞ্চিত-নিষ্ফলের দলভুক্ত করেছেন। ফলে কর্ণ চরিত্রটি বাঙালি পাঠক সমাজে সহানুভূতি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসু 'প্রথম পার্থ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবপ্রবণতাকে প্রাথমিকপর্যায়ে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসু আপন ব্যক্তিগত চিন্তা চৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাটকে। সামগ্রিক মহাভারত পাঠ অভিজ্ঞতা পর বুদ্ধদেব বসু একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে অতি নমনীয় ও কবি প্রাণ নিয়ে কাব্যনাটকটিকে প্রকাশ করেছেন। প্রধান চরিত্রগুলিকে একটি মানবিক মাত্রা দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণে আমরা মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে যখন 'প্রথম পার্থ' নাটকটি পড়ি তখন কোথাও এদের ধূসর যুগের মানুষ বলে মনে হয় না। আবেগে, বীরত্বে, ছলনায়, তারা মানবিক উষ্ণতায় পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়।

মহাভারতের কাহিনি নির্ভর কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর শেষ সংযোজন 'সংক্রান্তি'। এটি শারদীয় 'দেশ' সংখ্যায় ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। নাটকটির নামকরণে ঘটনাবস্তুর আভাস স্পষ্ট। মাসের শেষ তারিখ সংক্রান্তি নামে পরিচিত। বর্তমান নাটকের ঘটনা নির্মিত হয়েছে যুদ্ধের অন্তিম দিনের কাহিনি অবলম্বনে। এই কারণে ‘সংক্রান্তি’ নামকরণ যথার্থ। নাটকের ঘটনাস্থান হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদ। সময়কাল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্তিম দিন। বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের চিরপরিচিত ঘটনা ধারায় বিবৃত করেছেন জীবনের সুমহান তত্ত্বখানি। নাটকটিতে রয়েছে মাত্র তিনটি চরিত্র। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের কৌরবাধিপতি। তার অনুগত সারথি সঞ্জয়। বর্তমানে সে ব্যাসদেবের আশীর্বাদে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সংঘটিত রণক্ষেত্রের ধারাভাষ্যকার। আর রয়েছেন হস্তিনাপুরের রাজ্ঞী মাতা গান্ধারী। এদের তিনজনের সংলাপে ফুটে উঠেছে মহাভারতের মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় রণক্ষেত্রের রূপ। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণে উঠে এসেছে জীবনের উত্থান-পতন ও জীবনের নিয়তিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার আহ্বান।

নাটকের শুরু হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের সূর্য বন্দনার মধ্য দিয়ে। আজ মহাযুদ্ধের অষ্টাদশতম দিন। সকাল থেকেই মহারাজা চঞ্চল, 'অস্থির নিদ্রার পর গাঢ়তর ক্লান্তি' তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নাটকের প্রথমাংশে দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে ধৃতরাষ্ট্র নিজের জীবনকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মহাভারতকারের রচনায় এমন আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ ছিল কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু কবি বুদ্ধদেব বসু আবেগঘন ভঙ্গিতে ধৃতরাষ্ট্রের মনোবিশ্লেষণ করেছেন। তার সংলাপে কবিতার মাধুর্য ধ্বনিত হয়েছে সত্য, কিন্তু কাব্যের সুরেলা পেলবতা প্রতিধ্বনিত হয় হয়নি। বরং তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ গাম্ভীর্য ও গাঢ়ত্বে পরিস্থিতির অসহায়তা, অস্তিত্বহীনতা ও দুঃসহ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় ব্যথাতুর। তবে 'সংক্রান্তি' নাটকটি বুদ্ধদেব বসুর পূর্বেকার কাব্যনাটকগুলির মতো আবেগের প্রকাশ তুলনায় কম। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও যুদ্ধের করুণ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে যুদ্ধের শেষতম দিনে দুর্যোধনের করুণ মৃত্যু বর্ণনায়। জীবনের চরম সার্থকতা বা ব্যর্থতার উপরে যে অবস্থান করছে চরম 'নিয়তি', তা-ই ঘটনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে এ নাটকে। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও আসলে এ কাহিনি মানব জীবনের চিরকালীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা নাট্য জগতে মনোজ মিত্র একজন স্তম্ভ প্রতীম ব্যক্তিত্ব। ৮০ বছর বয়সেও যার নাটক এবং অভিনয় পাঠক ও দর্শকদের মোহিত করে রেখেছে। 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) তার প্রথম নাটক। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি আশি বছরের বৃদ্ধের অভিনয় করেছিলেন। বাঙালিকে সেদিন নাট্যকার এক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন। জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে, তবু আমরা কেউই মৃত্যুর প্রত্যাশী নই — এক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তরুণ যুবক। আজ, ৮১ বছর বয়সেও সেই ‘যুবকটি’ সমানভাবে আমাদের নতুন ভাবে জীবন ও জগতকে বিশ্লেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার নাটকের বিষয়বস্তু বিচিত্র। আঙ্গিকও তেমনি বহুবিধ। কখনো হাসির আড়ালে, কখনো কবিতার রহস্যময় আধারে, কখনো রোমান্সের অভিব্যক্তিতে তিনি জীবনের প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করেন। পূর্ণাঙ্গ, স্বল্প পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক সমস্ত ধরনের নাটক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আজ পর্যন্ত তার নাটকের সংখ্যা প্রায় ৭৫। প্রতিমুহূর্তে তিনি পাঠক এবং দর্শককে নতুন ধরনের নাটক উপহার দিতে তৎপর। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি নাটক রচনা করেন, যার নাম 'তক্ষক'। সাপের নামে নামাঙ্কিত এ নাটকে তিনি প্রতিস্থাপিত করেছেন জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।

এ নাটকে আমরা দেখলাম জীবনকে উপভোগ করার জন্য মৃত্যুর অভিশাপকে বরণ করে নিলেন মহারাজ পরীক্ষিত। রাজা জীবনের যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই তিনি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। সুখ-দুঃখ,বাধা-বিপত্তি, সম্পদ-বিপদের সহাবস্থানে জীবন চলে। এ জীবন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, বেদনায় নুব্জ্য হয়। তবুও জীবন এগিয়ে চলে স্বগতিতে। যে মানুষ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনকে সহজে বরণ করে নেন, তিনি প্রকৃত বীর, যথার্থ জয়ী। মনোজ মিত্র পৌরাণিক পটভূমিতে রাজা পরীক্ষিতের গল্পে আমাদেরকে সংকট থেকে উত্তরণের বার্তা দিয়েছেন। রাজা পরীক্ষিত যেমন করে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে আলিঙ্গন করে নিলেন। তদ্রূপ আমাদেরও সমস্ত সংকট কাটিয়ে জীবনকে ভালোবেসে বরণ করে নিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিণী, আনন্দ, কলকাতা-৯

২. বুদ্ধদেব বসু, কালসন্ধ্যা, দে'জ, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৩

পঞ্চম অধ্যায় : সাতের দশকে (১৯৭১-১৯৮০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতীয় ঘটনার পুনর্বিন্যাস

সত্তরের দশক বাংলার ইতিহাসে এক অগ্নিগর্ভ দশক। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল উত্তাল। খুন-জখম-রাহাজানি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। নাটকের শিল্পীরা বারবার আক্রান্ত হয়েছেন নানাভাবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত কয়েকটি নাটক হল মনীন্দ্র রায় রচিত 'নাটকের নাম ভীষ্ম' (১৯৭২), মনোজ মিত্র লিখিত 'অশ্বত্থামা' (১৯৭৮)। বিশেষত মনোজ মিত্রের নাটক সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচ পাওয়া।

একালের অন্যতম প্রতিভাধর, শক্তিশালী ও জনপ্রিয় নাটককার মনোজ মিত্র। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নাট্য রচনা, নাট্য প্রযোজনা, নাট্য নির্দেশনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। ৮০ বছর বয়সেও তাঁর কলম সমানভাবে ক্রিয়াশীল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে 'অশ্বত্থামা' নাটক। মহাভারতে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কৌরব পক্ষের শক্তিশালী একজন বীর যোদ্ধা। সে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছিল মহাযুদ্ধের একেবারে শেষ অংশে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের আঠেরো দিনব্যাপী যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অশ্বত্থামার হাতে। যুদ্ধের এই শেষ অংশটুকু পরিস্ফুট হয়েছে 'অশ্বত্থামা' নাটকে। মহাভারতের এই অংশটির পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে নাট্যকার সুকৌশলে সাম্প্রতিককালের হিংস্রতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সত্তরের দশক বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে এক প্রবল অস্থিরতার যুগ। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সত্তর দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস অস্থিরতা ও নাটকীয় বৈচিত্রে ভরপুর। এই যুগে একদিকে দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায় নীতি সম্পর্ক, শ্রেণীরসম্পর্ক, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সহ সমস্ত কিছুতে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্তর দশকের দানবীয় বীভৎসতার পাশাপাশি মানবিক সৌন্দর্য ও ধ্বংসলীলা স্থান পেয়েছে সাবলীলভাবে। ষাটের দশকে উদ্ভূত যে আর্থসামাজিক সংকট পশ্চিমবাংলায় দেখা দিয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে সত্তর দশকের ভারতবর্ষ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছিল। এই রকমই অস্থিরময় অবস্থায় বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, শৌর্যবীর্য, কাপুরুষতা, ভন্ডামি, মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, আবার মানবতার প্রতি চরম অবজ্ঞা সমস্ত কিছুই একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল। এই দশক মুক্তির দশক হিসেবে পরিণত হতে চেয়েছিল। তবে শেষ অবধি কিছু ভ্রান্ত ধারণার কারণে তা সম্ভব হয়নি। আলোচ্য নাটকে মহাভারতের দুর্যোধন, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথনে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত চরিত্রগত উপাদানের মাধ্যমে সত্তর দশকের পরিপূর্ণ চিত্র সচেতনভাবে নাটকে পরিস্ফুট। ফলে নাটকটি পড়তে গিয়ে পাঠকের কখনোই মনে হয় না, এ নাটক কয়েক সহস্র বছর আগের ঘটনা, তা হয়ে যায় সমকালীন যুগে প্রতিভাষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আটের দশকে (১৯৮১-১৯৯০ সাল) বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির প্রয়োগ ও পর্যালোচনা

সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট সবকিছুর মধ্য থেকেই বাঙালি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে; চলে সাংস্কৃতিক চর্চাও। এই সময়কালে বাংলা নাট্য সাহিত্যে দ্রৌপদী চরিত্রটিকে নতুন ভাবে আধুনিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে শাঁওলী মিত্র রচনা করলেন 'নাথবতী অনাথবৎ' (১৯৮৩)। মহাভারত বাংলা সাহিত্যে যত বেশি চর্চিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত চরিত্র দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর অন্তর্জালা, তেজস্বিতা, তার অপমান এবং পঞ্চ স্বামী থাকা সত্ত্বেও অনাথবৎ হবার যন্ত্রণা বারবার স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে। তবে কেবল বাংলাতেই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার মহাভারতে দ্রৌপদী গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করেছেন। নারীত্বের অহমিকা, তেজস্বিতা, দুর্বলতা, অসহায়তা একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। এক কথায় দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যে চিরকালীন বঞ্চিত অসহায় নারী হৃদয়ের আর্তি শোনা যায়। মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুবোধ সরকার, সব্যসাচী দেব প্রমূখ কবিদের কলমে এবং ব্রততী বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দ্রৌপদীর অসহায় যন্ত্রণা আধুনিক নারী যন্ত্রণার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর অপমান যেন নারীর অপমান, দ্রৌপদীর আত্মাভিমান যেন নারীর অহংকার।

'নাথবতী অনাথবৎ' শাঁওলি মিত্রের একটি কালজয়ী সৃষ্টি। আগাগোড়া গদ্য পদ্যের মিশেলে একক সংলাপময় নাটক এটি। এ নাটকে মহাভারতীয় পটভূমিতে নাট্যকার সচেতনভাবে একালের নারীর দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা-অপমানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি পাঠকের উপর বিচার ভার অর্পণ করে নাটক শুরু হয়েছে কথকতার ঢঙে। কথকতা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য। যুগে যুগে সাধারণ মানুষের কাছে পুরাণ-উপপুরাণ পৌঁছে দিতে এই কথকতাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। নাট্যকার সেই রীতিকে ব্যবহার করেছেন মহাভারতের দ্রৌপদীর কাহিনি ব্যাখ্যানে। নাট্যকার বারংবার পাঠক ও দর্শককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এ নাটকের কাহিনি পুরাকালের

মহাভারতের বটে, কিন্তু তা সমকালের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমগ্র নাটক জুড়ে দ্রৌপদীর বকলমে নাট্যকার বর্তমান সমাজ অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে লেখিকা উল্লেখ করতে ভোলেননি, কেন তিনি দ্রৌপদীর চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন আধুনিক নারী যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার জন্য!! ১৯৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত কয়েকটি ভয়াবহ কাহিনির উল্লেখ করে নাট্যকার জানিয়েছেন চিরকালীন নারী-জীবনের অস্তিত্বহীনতা এবং অবমাননার ইতিকথা তিনি প্রকাশ করেছেন দ্রৌপদীর বুক ভরা হাহাকার ও অন্তর যন্ত্রণার মাধ্যমে। মহাকাব্যের অসামান্য নারী দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে মহাভারতের সমাজকে দেখেছেন নাট্যকার, আর মহাভারতের কথা বলতে বলতে উঠে এসেছে বর্তমানকালের প্রসঙ্গ। প্রাচীন এবং আধুনিক কালের সঙ্গে তুলনা করতে করতে নাটক এগিয়ে চলেছে স্ব-গতিতে। নাট্যকার জানাচ্ছেন —

"এই তুলনা-প্রতিতুলনা চলতে থাকে সারা নাটক জুড়ে। তাই আজকের যে কোন সাধারণ মানবীও হয়তো সেই মহাভারতের অতুলনীয়ার সঙ্গে তাঁর ভয়ানক অসম্মানের জীবনযাপনের সঙ্গে, নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেন।"[১]

মহাভারতের ঘটনা পরম্পরা বা কাহিনি উল্লেখ না করেও যে মহাভারতের কাহিনিটিকে আধুনিক উপযোগী করে উপস্থাপিত করা সম্ভব, তা দেখালেন নাট্যকার বাদল সরকার। বাংলা নাট্য জগতে বাদল সরকার এক স্বতন্ত্র নাট্যধারার প্রবর্তক। সুনির্দিষ্ট কোন কাহিনি, প্লট বা চরিত্রের ক্রমবিকাশের বাঁধাধরা নিয়মে তাঁর নাটক রচিত নয়। ‘থার্ড থিয়েটার আন্দোলন’ নামে চিহ্নিত তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের কথা সাধারণভাবে উঠে এসেছে। তার নাটকের বক্তব্য বিষয় পাঠককে নতুন ভাবনায় উদ্বোধিত করে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'সলিউশন এক্স', ‘মিছিল’, ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’, ‘হট্টমালার ওপারে’, নাটকগুলি পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এরকমই এক জনপ্রিয় নাটক ‘উদ্যোগ পর্ব’। নাটকটি পথ নাটক হিসেবে চিহ্নিত। মাত্র সাতটি চরিত্রের সমাবেশে, স্বল্পপরিসরে যে সংলাপ নাট্যকার এ নাটকে পাঠককে শোনালেন তা দেশ-কাল সময়ের ঊর্ধ্বে — তা চিরকাল ধরে একই স্রোতে, একই প্রবাহে নিয়ত প্রবহমান। "নাটকটি মৌলিক। এছাড়া কিছু বলবার নেই।" মুখবন্ধে এইটুকু বক্তব্য যিনি বলেন তিনি যে স্বল্প কথায় বৃহত্তর দেশ-কাল-সমাজকে মুঠোর মধ্যে ধরবেন, তাতে আশ্চর্য কি! অসামান্য দক্ষতায় নাট্যকার কেবলমাত্র 'উদ্যোগ পর্ব' নামকরণের গভীর ব্যঞ্জনায় একালের পটভূমিকায় মহাভারতের মহাকাব্যিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে আনলেন। মহাকাব্যিক বিস্তারের শত সহস্র শ্লোকের অনুপস্থিতিতে মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে তিনি মহাভারতের কাহিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। এ যেন গোষ্পদে বিশ্ব দর্শন। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত ‘অঙ্গন পত্রিকায় ‘উদ্যোগ পর্ব’ প্রথম প্রকাশ পায়। এর নাট্য ঘটনায় বাদল সরকার অসাধারণ পারঙ্গমতায় মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে এযুগের সমস্যাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। একজন দক্ষ শিল্পী, বিশেষত সমাজ সচেতন শিল্পী ব্যতীত এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পৌরাণিক আবহে বাদল সরকার অসাধারণ নাট্যিক দক্ষতায় বর্তমান কালকে উপস্থাপিত করেছেন। মহাভারতের কাহিনি যে কোনো ধূসর অতীত জীবনের গল্প নয়, তা যুগ যুগ ধরে কালের সঙ্গে বহমান তার প্রকাশ ‘উদ্যোগ পর্ব’ নাটকখানি।

<u>তথ্য সূত্র:</u>

১. শাঁওলী মিত্র, নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃত সমান, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৩, *কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫*

সপ্তম অধ্যায় : নয়ের দশকে (১৯৯১-২০০০ সাল) নতুন রূপে বাংলা নাটকে মহাভারতীয় বিন্যাস

দীর্ঘ ১৫০ বছরের বাংলা নাটক এগিয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রবল গতিবেগে। প্রতিভাবান, দক্ষ সাহিত্যিকদের হাতে বাংলা নাটক বাঙালির গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য নানা ধরনের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে এই দশকে বেশ কিছু মহাভারত নির্ভর নাটক রচিত হচ্ছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘নন্দন কাননে দ্রৌপদী’ (১৯৯২), যার মধ্যে অন্যতম। নাটকটিতে মহাভারতের পুরোপুরি কাহিনি নেই। আভাস আছে মাত্র। তবে প্রতিটি চরিত্র মহাভারতীয়। তাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন কবি মহাকাব্যিক ঘটনা ধারায় যা অনন্য সাধারণ রূপ পেয়েছে। এছাড়াও শাঁওলী মিত্রের ‘কথা অমৃত সমান’ (১৯৯১), রতন কুমার ঘোষের ‘মহাকাব্য’ এবং তরুণ সান্যাল রচিত ‘কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম ও গান্ধারী’ (২০০০) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাঁওলী মিত্রের মহাভারত নির্ভর দ্বিতীয় কীর্তি 'কথা অমৃতসমান'। মহাভারতের প্রতি দুর্বলতা থেকে শাঁওলী মিত্র মহাভারতের চরিত্রগুলিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। নট ও নাট্যকার শাঁওলী মিত্র যখন 'কথা অমৃতসমান' নাটক রচনা করেন, তখন নাটকের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন মহাভারতের প্রতি আকর্ষণের কারণেই তার এই মহাভারত নির্ভর কাহিনি রচনা প্রয়াস।

এর আগে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকটি রচনা করেছিলেন, সেখানে কেবলমাত্র দ্রৌপদীকে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু 'কথা অমৃতসমান' নাটকে মহাভারতের প্রায় সমগ্র কাহিনিকে এক মঞ্চে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র মহাভারত গুরুত্ব পেলেও এখানে নাট্যকার মহাভারতীয় আয়নায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন কয়েকটি নারী চরিত্রকে। মহাভারত মূলত পুরুষদের বীরত্ব ও উদগ্র লোভের কাহিনি। কিন্তু সেই কাহিনির আবর্তে কিভাবে নারীদের জীবন-যৌবন নানা ভাবে নিস্পেষিত, উপেক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়েছিল, তার কথা আলাদাভাবে স্থান পেয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার সচেতনভাবেই এখানে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী ও দ্রৌপদী চরিত্রকে। সমগ্র কাহিনি ব্যাখ্যা করে এই নারী চরিত্রগুলির উপর আলোকপাত করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, মহাভারতের মূল ঘটনায় এরা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এদের চাওয়া পাওয়া বা আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে গভীর থেকে গভীরতর সংকট। আর সেই সংকটকে পূরণ করতে মহাকাল এগিয়ে গেছে স্রোতস্বিনী নদীর মত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘নন্দন কাননে দ্রৌপদী’ (১৯৯২), নাটকটিতে মহাভারতের পুরোপুরি কাহিনি নেই। আভাস আছে মাত্র। তবে প্রতিটি চরিত্র মহাভারতীয়। তাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন কবি মহাকাব্যিক ঘটনা ধারায় যা অনন্য সাধারণ রূপ পেয়েছে। একবিংশ শতকে একজন কবি যখন মহাভারতের কাহিনি নিয়ে কাব্যনাটক রচনা করেন, সেখানে মহাভারতের কাহিনি, ঘটনা পরম্পরা আমূল বদলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মহাকবির কলমে যে ঘটনার হয়তো বিন্দুমাত্র আভাস ছিল, তাকেই বিশদে প্রতিস্থাপিত করেছেন আধুনিক কালের কবি সাহিত্যিকগণ। একালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রে আপন জয়ধ্বজা উড্ডীন করলেও নাটক রচনায় খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। তাঁর মনে হয়েছে নাটকের একটি প্রায়োগিক দিক আছে। তবু তার হাতে যে দু’চারটি নাটক রচিত হয়েছে, তার মধ্যে ‘নন্দনকাননে দ্রৌপদী’ (১৯৯২) কাব্যনাটকটি সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত। নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অভিনব। মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও এ ঘটনার বিবরণ মহাভারতের পাঠক কখনো পড়েননি। মহাভারতের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে পাণ্ডব ও কৌরবদের পারস্পরিক বিবাদ এবং সব শেষে এক ভয়াবহ যুদ্ধে। কাহিনি সমাপ্তিতে দেখা গেছে, যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পাণ্ডবেরা বহু আকাঙ্খিত সিংহাসনে লাভ করেছে বটে,তবে শান্তি লাভ করতে পারেনি। স্বজন হারানোর বেদনায় তারা নিয়ত মর্মবেদনায় পীড়িত হয়েছে। অবশেষে প্রায় ছত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর হস্তিনাপুর রাজসভার সিংহাসন পৌত্র পরীক্ষিতের হাতে সমর্পণ করে পাঁচ ভাই স্ত্রী দ্রৌপদী সহ বেরিয়ে পড়েছেন মহাপ্রস্থানের পথে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং পথশ্রমে ক্লান্ত একে একে পতন হয়েছে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমসেনের। একমাত্র যুধিষ্ঠির তার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ মনুষ্য শরীর নিয়ে প্রবেশ করেছেন স্বর্গধামে। ‘নন্দনকাননে দ্রৌপদী’ কাব্য নাটকের কাহিনির সূত্রপাত এই অংশ থেকে। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবনের গল্প রচনা করেছেন নাট্যকার। এ কাহিনি অবশ্যই কাল্পনিক কিন্তু তার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে হাসি-কান্না ভরা জীবনের গভীর ব্যঞ্জনা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত' নন্দনকাননের দ্রৌপদী' কাব্য নাটকে আধুনিককালের কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা চৈতন্য নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে নাট্যকারের প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রচলিত ধারার নাটকের মত কোন অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন এখানে নেই। নাট্যকার মাত্র একটি দৃশ্যে, স্বল্প পরিসরে, কয়েকটি চরিত্রের বক্তব্যে, কিছু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন একালের দৃষ্টিতে। আসলেই মহাকবির কলমে এমন ইঙ্গিত বর্তমান ছিল যে, এ কালের কবি অনায়াসেই তার মধ্যে আধুনিক জটিল জীবনকে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'প্রথম পার্থ' বা সব্যসাচী দেবের 'কৃষ্ণা' কবিতার মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যা প্রক্ষিপ্ত ছিল, তাকেই নাট্যিক বিশ্লেষণে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দ্রৌপদীর জীবনের যে নতুন ব্যাখ্যা পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, একালের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা একেবারেই যেন বাস্তব। নাট্যকার এখানে নায়কের ভূমিকায় অভিষিক্ত করেছেন কর্ণকে। যুধিষ্ঠির কেবল দর্শক মাত্র। কর্ণ ও দুর্যোধনের বক্তব্যের গভীরতায় মহাভারতের নতুন পাঠ পাঠককে চমত্কৃত করে। লেখকের সুদক্ষ বিশ্লেষণে পুরাকালের চরিত্রগুলি একালের মানব-মানবীর রূপ ধারণ করেছে। পুরাণের এই নবরূপায়নে পাঠককুল নাট্যকারকে বিনাপ্রশ্নে কুর্নিশ জানান স্বতঃস্ফুর্ততায়।

উপসংহার :

নাট্যসাহিত্য বিকাশিত হয়েছিল পুরাণ নির্ভর কাহিনি থেকে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বহু জনপ্রিয় নাটক পুরাণ তথা মহাভারত কেন্দ্রিক। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে —

‘……. যতই যুগের বদল হবে ততই পৌরাণিক কাহিনির পরিচ্ছদ আধুনিক হবে ; কিন্তু পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাট্যচর্চা কোনোদিনই বন্ধ হবে না।’ তাঁর এই বক্তব্য শিরোধার্য করে বলা যায়, বাংলা নাটকে মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। প্রথমদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রাধান্য পেলেও তা নতুন সত্তা লাভ করেছে। মহাভারতের জটিল ও বিস্তৃত কাহিনির মধ্যে নাট্যকারেরা একালের জটিল জীবনের আভাস পেয়েছেন। তাই ধর্মভাবের পরিবর্তে নাট্যকারেরা সুকৌশলে মহাভারতের কাহিনিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। কারো মনে হতে পারে, পুরাণ তথা মহাভারত নির্ভর কাহিনির জনপ্রিয়তা আজ আর নেই। কথাটিকে একেবারে উড়িয়ে না দিয়েও বলা যায়, গিরিশযুগে পৌরাণিক নাটকে বিশেষত মহাভারত নির্ভর নাটকে (জনা,পাণ্ডব বিজয়, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি ইত্যাদি) যে ধর্মীয় ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল, এযুগের নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বা মনোজ মিত্রের রচনায় সেই ভক্তি বা আবেগ প্রকাশিত হয়নি বরং মহাভারতীয় নির্মোক খসে গিয়ে সেখানে আধুনিক জটিল মনস্তত্ত্ব, কখনোবা যুগ-পরিবেশের অস্থিরতা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। একটু বাংলা নাটকের ইতিহাসের দিকে নজর ঘোরালে দেখতে পাব, ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে মহাভারত অবলম্বনে বিপুল সংখ্যক নাটক রচিত হলেও বিংশ শতকের গোড়াতে তা কিছুটা হ্রাস পায়। বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতায় ধর্মীয়ভাব মূলক নাটক রচনা করা হয়তো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মন্মথ রায় ‘কারাগার’ নাটকে দেখালেন পুরাণের আবহের মধ্যেও সমকালীন রাজনীতিকে হুবহু প্রতিফলিত করা সম্ভব। যদিও তারপরে পৌরাণিক নাটক রচনা করার গতি মন্থরই থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, বাংলার ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদির কারণে মহাভারত নির্ভর নাটক কিছুটা গতি হারায়। কঠিন ও জটিল সমস্যায় জর্জরিত মানুষের মনে আসে নানা পরিবর্তন। ধর্মীয় ভাবাবেগের পরিবর্তে জীবনকে কঠোর বাস্তবের আয়নায় দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায় বাঙালি। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে পুনরায় একটু একটু করে আবার মহাভারতীয় পটভূমিকায় নাট্যকারেরা জীবনকে উপস্থাপিত করতে উৎসাহী হন।আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি যে, মহাভারতের কাহিনি আজ থেকে সহস্র বছর আগে রচিত হলেও, তা বর্তমানকালেও যে যুগোপযোগী, একালের নাট্যকারেরা বারংবার তার প্রমাণ দিয়েছেন। ১৯৫০-২০০০ সালের মধ্যবর্তী নাট্যকারদের নাটকগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি বাংলা নাটকে মহাভারতের কাহিনির কোথায় কোথায় প্রয়োগ হয়েছে। আমরা প্রমান করতে চেষ্টা করেছি নাট্যকারেরা মহাভারত নির্ভর হযেও সহৃদয় পাঠক সমাজকে এবং রঙ্গমঞ্চ প্রিয় বাঙালিকে উপহার দিয়েছেন আধুনিক মনসঞ্জাত নাটক। অনেকের মতে আধুনিক যুগে মহাভারতের প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিন্তু নজর দিলেই বোঝা যাবে এর কাহিনিতে যে গভীরতা, যে ব্যাপ্তি, যে দর্শন নিহিত আছে তা সব কালে, সব যুগের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। তাই যুগে যুগে, কালে কালে সব মানুষের কাছে মহাভারত ও মহাভারতীয় কাহিনি এত আদরণীয় ও গ্রহণীয়।

:গ্রন্থপঞ্জী:

আকর গ্রন্থ

১. কাশীরাম দাস, কবি ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, মহাভারত (প্রথম খণ্ড), বসুমতি সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬, বিবিগাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা – ১২, ৩৩তম সংস্করণ, ১৩৯৫

২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড

৩. রাজশেখ বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি:,
কলকাতা - ৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ, ১৪২০

৪. মহেন্দ্র গুপ্ত নাটক সমগ্র, প্রথম খন্ড (পৌরাণিক), প্রকাশক: ইভা গুপ্ত পানি, ‘সুবর্ণরেখা’, মানগো, জামশেদপুর, জানুয়ারি, ২০১০

৫. বুদ্ধদেব বসু, কালসন্ধ্যা, দে'জ, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭৩, আগস্ট ২০০২

৬. নাটক সমগ্র, বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৩, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ

১. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

২. ড. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯০০), প্রথম খন্ড, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০)

৩. শ্রী অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, ৫৮ শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, জুন ১৯৯৯

৪. সম্পাদনা দেবাশিস মজুমদার, শেখর সমাদ্দার, শতাব্দীর নাট্যচিন্তা - গিরিশচন্দ্র থেকে উৎপল দত্ত, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা-৭০০০৭৩, মার্চ, ২০০০

৫. ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আধুনিক যুগ (১৮০০-১৯৬০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, টি ৩/বি কলেজ রো, কলকাতা - ৯, ২য় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০০৭

৬. তরুণ মুখোপাধ্যায়, কাব্যনাট্য বিভাবনা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, বইমেলা ২০০৭

৭. বাদল সরকার, এবং ইন্দ্রজিৎ, সপ্তম সংস্করণ, ২৬৮ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮, অষ্টম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৯

৮. ড. গীতশ্রী দে (সরকার), দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৬৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯

৯. অমলেশ ভট্টাচার্য, মহাভারতের কথা, আর্যভারতী, ৬৩এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩,

অন্তর্জাল (ইন্টারনেট)

১. আবু সৈয়দ তুলু, দ্রৌপদীদের অপমান যুগ-যুগান্তরের (3rd October, 2019)
https://www.kaliokalam.com/দ্রৌপদীদের-অপমান-যুগ-যুগ/

২. মনসিজ মজুমদার, মহাভারতের গণ্ডি পেরিয়ে দ্রৌপদী যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়িকা, ১৫ অগস্ট, ২০১৪ (15 August, 2014)
https://www.anandabazar.com/supplementary/patrika/মহ-ভ-রত-র-গণ-ড-প-র-য়-1.59260

৩. পূরবী বসু, পুরাণের পঞ্চকন্যা:বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে নব-রূপায়ণ (26th November, 2014)
http://www.bdcrimereport.com/?p=51478

৪. ইউটিউব লিংক (1st July, 2019)

https://youtu.be/JEiR6XeM5lo

৫. লিংক (October, 2019)
https://aparbangla.net/prabandho-pouranik-narir-naborupayan/

৬. সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহাভারত চর্চার দিশা ও বাঙালী মনীষা (Thesis Paper published on 2017)
http://hdl.handle.net/10603/245417

R. Roy

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর　　　　　　গবেষকের স্বাক্ষর